পৃথিবী

পৃথিবী

ড. মুকিদ চৌধুরী

আদিত্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশক
কাকলি বেগম
আদিত্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

একমাত্র পরিবেশক
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Prithibee (History of the Earth) by Dr. Mukid Choudhury
Published by Kakoli Begum

Adittya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

Only Distributor
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970

First Published : September 2020

Price : 300.00
US $ 15

ISBN 978 984 95024 5 6

ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উ ৎ স র্গ

প্রিয় নাতি ও নাতিন
রাহা দেওয়ান সৈয়দ
আর-রা'দ দেওয়ান সৈয়দ
নায়রা দেওয়ান সৈয়দ
ইনায়া চৌধুরী
মীরা দেওয়ান সৈয়দ
আরহাম দেওয়ান সৈয়দ

সূচি

মহাবিস্ফোরণ ৯
মহাবিশ্ব ২৯
সৌরজগৎ ৫৫
প্রাক-ক্যামব্রিয়ান মহাকাল ৮৩
ক্যামব্রিয়ান মহাকাল ১১৯

মহাবিস্ফোরণ

স্বচ্ছ স্ফটিক গঠিত পৃথিবীর[১] অনন্ত আকাশ নীল হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধগোলকের মতো। কখনো মেঘে ঢাকা। কখনো-বা সোনালি কিংবা রুপালি। ঘুরছে আস্তেধীরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। তাই আকাশের উজ্জ্বলতম বস্তু ও স্বকক্ষপথে পরিক্রমশীল সূর্য[২] পূর্বদিগন্তে উদয় হয়, আর পশ্চিমদিগন্তে অস্ত যায়। নির্মলনির্মেঘ সন্ধ্যাকাশে দেখা যায় রাশি রাশি আলোকবিন্দু (তারা[৩])। কতকগুলো উজ্জ্বল— দপদপ করে জ্বলছে। কতকগুলো মিটমিট। আবার কতকগুলো অত্যন্ত ম্লান। প্রতিটি আলোকবিন্দুতে রয়েছে একগুচ্ছ রং। সেসকল আলোকবিন্দুর আলো বিভিন্ন

১ ইংরেজি : earth; লাতিন : terra; জ্যোতির্বিজ্ঞান চিহ্ন : ⊕। বাংলায় সমার্থক শব্দ : অখিল, অখিলখণ্ড, অচলকীলা, অচলা, অদিতি, অদ্রিকীলা, অধিলোক, অনন্তা, অবনিমণ্ডল, অব্ধিদ্বীপা, অব্ধিমেখলা, অবনি, অবনিতল, আদিম, আদ্য, ইড়া, ইড়িকা, ইরা, ইলা, ইলিকা, ইহজগৎ, ইহলোক, উদধিবস্ত্রা, উর্বরা, উর্বী, কাশ্যপী, ক্রোড়কান্তা, ক্ষমা, ক্ষিতি, ক্ষিতিজ, ক্ষোণি, ক্ষৌণী, ক্ষমা, খগবতী, খণ্ডনী, গন্ধবতী, গিরিকর্ণিকা, গো, গোত্রা, চরাচর, জগ, জগৎ, জগতী, জগদ্বহা, জাহান, জীবলোক, জ্যা, দুনিয়া, দোহিনী, দ্বিরা, ধরণি, ধরা, ধরাতল, ধরাধাম, ধরিত্রী, ধাত্রী, ধারণি, ধারতি, ধারয়িত্রী, ধারিণি, নরলোক, নিখিল, নিশ্চলা, নৃলোক, পারা, পিষ্টপ, পৃথিবী, পৃথিবীতল, পৃথিবীমণ্ডল, পৃথ্বী, বরা, বিপুলা, বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী, বসুমাতা, বিশ্ব, বিশ্বম্ভরা, বীজপ্রসূ, বীজসূ, ভবলোক, ভুবন, ভুবনমাতা, ভূ, ভূখণ্ড, ভূতধাত্রী, ভূতল, ভূভাগ, ভূমণ্ডল, ভূমি, ভূর, ভূর্লোক, ভূলোক, মনুষ্যলোক, মরজগৎ, মর্ত্য, মর্ত্যধাম, মর্ত্যলোক, মহা, মহাকান্তা, মহি, মহিমণ্ডল, মেদিনী, রত্নগর্ভা, রত্নাবতী, রসা, শ্যামা, সংসার, সর্বংসহা, সপ্তদ্বীপা, সমুদ্রমেখলা, সমুদ্রাম্বরা, সসাগরা, সাগরনেমি, সাগরমেখলা, সাগরাম্ববরা, সৃষ্টি, সৃষ্টিতল, স্থিরা ইত্যাদি।

২ বাংলায় সমার্থক শব্দ : রবি, ভাস্কর, ভানু, আদিত্য, তপন, মিহির, অর্ক, মার্তণ্ড, দিননাম, দিনমণি, অরুণ, দিনেশ, সবিতা, দিবাকর, বিবস্বান, বিভাবসু, পূষণ, বিভাকর, প্রভাকর, অংশুমান, ত্বিষাম্পতি প্রভৃতি।

৩ ধ্রুব, ব্রহ্মহৃদয়, লুব্ধক, অগ্নি, স্বাহা, অনসূয়া, লজ্জা, প্রীতি, আর্দ্রা, বিশাখা, বাণরাজা, অগস্ত্য, প্রভাস, মঘা, উত্তরফাল্গুনী, পূর্বফাল্গুনী, অরুন্ধতী, চিত্রা, অভিজিৎ, স্বাতী, নহুষ, পূর্বাষাঢ়া, শ্রাবণ, উত্তর ভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা ইত্যাদি বাংলা নামের তারা।

মাত্রায় বিচ্ছুরিত হয়ে সৃষ্টি করে বিভিন্ন রঙের বর্ণচ্ছটা। এসব আলোকবিন্দুর বর্ণালি অনুসারে বিন্যস্ত হয় বিভিন্ন বর্ণালিশ্রেণিতে। এক একটি বর্ণালিশ্রেণি নির্দেশ করে আলোকবিন্দুসমূহের এক একরকম তাপমাত্রা। আলোকবিন্দুর গ্যাসীয় পদার্থ যত বেশি উত্তপ্ত তত বেশি দ্রুত আলোড়িত হয় তার অণুপরমাণু। নীলতম আলোকবিন্দু চল্লিশ হাজার কেলভিন, নীলাভ আলোকবিন্দু আঠারো হাজার কেলভিন, নীলভশ্বেত আলোকবিন্দু দশ হাজার কেলভিন, শ্বেত আলোকবিন্দু সাত হাজার কেলভিন, হলদেশ্বেত আলোকবিন্দু সাড়ে পাঁচ হাজার কেলভিন, হলদে আলোকবিন্দু চার হাজার কেলভিন, লোহিত রঙের আলোকবিন্দু সাড়ে তিন হাজার কেলভিন ইত্যাদি। আলোকবিন্দুসমূহ একই আকারের নয়, বিচিত্র রূপ ও আকারের। আলোকবিন্দুসমূহের মৌলিক বৈশিষ্ট্য : দূরত্ব, ধ্রুবপ্রভা বা দীপ্তি, তাপমাত্রা, ব্যাস, ভর, গঠন, চৌম্বকক্ষেত্র, আবর্তন ও গতিবেগ। আলোকবিন্দুসমূহ সাধারণত পূর্বদিগন্তে উদয় হয় আর পশ্চিমদিগন্তে অস্ত যায়। এসব আলোকবিন্দুকে সাধারণত নক্ষত্র[৪] (তারাগুচ্ছ) বলে। তারা আর নক্ষত্র বলতে সাধারণ মানুষের কাছে একই জিনিস। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ভাষায় তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মতে, তারা একা একা মহাকাশে থাকে না; কয়েকটি তারা গুচ্ছ বেঁধে থাকে। এই তারাগুচ্ছকেই বলে নক্ষত্র। মহাকাশের অসংখ্য আলোকবিন্দুকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় : গ্রহ এবং নক্ষত্র। গ্রহগণ অত্যন্ত ম্লান ও অচপল আর নক্ষত্রগুলো দপদপ কিংবা মিটমিট করে জ্বলছে। গ্রহ ও নক্ষত্র যে মহাকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একটি শ্বেতপথের রচনা করে তাকে বলা হয় ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জ[৫]। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে বলে নক্ষত্রপুঞ্জ[৬]। এক এক নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত নক্ষত্রসমূহ মিলে যে আকৃতি ধারণ করে, সেই আকৃতি অনুসারেই নক্ষত্রপুঞ্জকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকালে আকাশের গোলকটি অর্ধেক দেখা যায় পৃথিবীর ভূমিতল থেকে, বাকি অর্ধেকটা থাকে দিগন্তের নিচে। এই গোলকের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী। অনন্ত মহাকাশ এবং তার অন্তর্গত

৪ একত্রে অবস্থিত নক্ষত্রদল (Constellation)।

৫ Milky Way Galaxy.

৬ Galaxy.

সকল উপকরণ নিয়ে অনন্ত অসীম ও সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব[৭] গঠিত হয়েছে।

বর্তমানে মহাবিশ্বকে যেভাবে পাওয়া যায়, আদিতে কিন্তু সেরকম ছিল না। মহাবিশ্বের উষালগ্নে তার প্রকৃতি ছিল অন্যরকম; বর্তমানের মতো নয়। অনেকটা আলাদাই ছিল। প্রকৃতিও ছিল অন্যরকম। চারটি মৌলিক শক্তি : সবল-নিউক্লীয়-শক্তি, দুর্বল-নিউক্লীয়-শক্তি, তড়িৎ-চৌম্বকীয়-শক্তি[৮] ও মহাকর্ষীয়-শক্তি এক সময় *সুপারফোর্স* বা অতিবৃহৎশক্তি[৯] হিসেবে একসঙ্গে মিশে ছিল। সেভাবেই ছিল এই চারটি মৌলিক শক্তি মহাবিশ্বের উষালগ্ন থেকে শুরু করে দশ থেকে তেতাল্লিশ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ডে মহাবিশ্ব ছিল জ্বলন্ত এক নিউক্লীয় চুল্লি। তাপমাত্রা : সীমাহীন। সেই সময় কোনো চেনাজানা কণা ছিল না, চারদিক পূর্ণ ছিল শুধু আহিতকণা[১০] ধোঁয়াশায়। এক সেকেন্ড পর কোয়ার্ক, ইলেকট্রন[১১], প্রোটন[১২] ও নিউট্রনের[১৩] মতো মৌলিক

৭ Univers.

৮ যে শক্তি পরমাণুর নিউক্লিয়াস, পরমাণুর বাইরের দিকে বিভিন্ন খোলকে থাকা ইলেকট্রনগুলোকে ধরে ও বেঁধে রাখে, সেই শক্তির নাম হচ্ছে তড়িৎ-চৌম্বকীয় শক্তি (Electromagnetic Force).

৯ *অতিবৃহৎশক্তি* (Superforce)-এর চেয়ে শক্তিশালী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে আর নেই।

১০ প্লাজমা (plasma) : উচ্চ আয়নযুক্ত গ্যাস যা আনুমানিক সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন এবং ইলেকট্রন ধারণ করে।

১১ পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণিকা ইলেকট্রন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জে. জে. থমসন সর্বপ্রথম ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। একটি ইলেকট্রনের মূলভর অতিসামান্য : ৯.১০৮৫ × ১০$^{-২৮}$ গ্রাম। ইলেকট্রনের আধান −১.৬ ×১ ০$^{-১৯}$ কুলম্ব । ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান। ইলেকট্রনকে সাধারণত e প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

১২ প্রোটন ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কণিকা, যা নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড প্রোটনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। একটি পরমাণুতে ইলেকট্রনের সমান সংখ্যক প্রোটন থাকে। প্রোটনের ভর ১.৬৭৩ × ১০$^{-২৪}$ গ্রাম। একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলেই প্রোটন পাওয়া যায়; তাই একে H^+ বলা হয়। একে সাধারণত p প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

১৩ ইলেকট্রন ও প্রোটনের মতো নিউট্রনও একটি মৌলিক কণিকা; তবে এটি আধানবিহীন (neutral)। নিউট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থান করে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে জেমস চ্যাডউইক নিউট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এর মূল ভর ১.৬৭৫ × ১০$^{-২৪}$ গ্রাম। একে সাধারণত n প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই দুই কণিকার সম্মিলিত ভরকে পারমাণবিক ভর বলা হয়।

কণিকাগুলো তৈরি হয়। তিন সেকেন্ড পর, প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরি হয় নিউক্লিয়াস। তারপর যথাক্রমে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও লিথিয়াম। তবে মহাবিশ্বের উদ্ভবের প্রায় কয়েক লাখ বছর পর্যন্ত যাকে জড়পদার্থ বলে সেইরকম কিছুই তৈরি হয়নি। তখন আসলে রঞ্জনরশ্মি আর বেতারতরঙ্গের মতো লম্বা দৈর্ঘ্যের অতিতেজি রশ্মিগুলোই বরং পদার্থের ওপর রাজত্ব করে। প্রায় চার লাখ বছর পর, তাপমাত্রা খানিকটা কমে ৩,০০০ কেলভিনে নেমে আসার পর, আহিতকণা ধোঁয়াশা থেকে স্থায়ী অণু গঠিত হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়। এ সময় মহাবিশ্বের কুয়াশার চাদর ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে, পথ তৈরি হয় ফোটনকণা চলাচলের। তারপরই কেবল তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের ওপর জড়পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়। তারপর প্রায় একশত কোটি বছর সময় নেয় নক্ষত্রপুঞ্জজাতীয় কিছু তৈরি হতে। পৃথিবী যে নক্ষত্রপুঞ্জে আছে তাকে *আকাশগঙ্গা*[১৪] বলে। এই *আকাশগঙ্গা* নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের সৃষ্টি হয় প্রায় পাঁচশত কোটি খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণমান গ্যাসীয় পদার্থের চাকতি থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে তৈরি হয় পৃথিবী-সহ অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো। মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন মুহূর্তে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম কিংবা লিথিয়ামের মতো মৌল তৈরি হলেও কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং লৌহ তৈরি হয়নি। এগুলো তৈরি হয় অনেক অনেক পরে, কোনো না কোনো নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ (সুপারনোভা) থেকে। বিজ্ঞানীরা গাণিতিকভাবে জানতে পারেন যে, প্রথম নক্ষত্র তৈরি হয় মহাবিশ্বের জন্ম থেকে অন্তত পঁচাত্তর কোটি বছর পর। নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ (সুপারনোভা) ঘটতে সময় লাগে আরও অনেক।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য সৃষ্টিতত্ত্বের নাম :

১৪ আকাশগঙ্গা একটি ছায়াপথ। সৌরজগতের সূর্য এই ছায়াপথের অংশ। পৃথিবীও। সূর্য এবং তার সৌরজগতের অবস্থান এই ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে প্রায় সাতাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কালপুরুষ বাহুতে অবস্থিত। এটি একটি দণ্ডযুক্ত কুণ্ডলিত ছায়াপথ, যা স্থানীয় ছায়াপথ সমষ্টির একটি সদস্য। আকাশগঙ্গার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক উপছায়াপথ এবং নিকটস্থ ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডাও এই সমষ্টির সদস্য। স্থানীয় সমষ্টি আবার ধনু মহাছায়াপথ স্তবকের অংশ। ধনু ছায়াপথস্তবক আবার ল্যানিয়াকেয়া মহাছায়াপথ স্তবকের মধ্যস্থ অনেকগুলো মহাছায়াপথ স্তবকের একটি। আকাশগঙ্গার কেন্দ্র বেতারতরঙ্গের একটি প্রবল উৎস। এই কেন্দ্রে একটি অতিভারবিশিষ্ট কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে (ধনু A*)। আকাশগঙ্গার ব্যাস আনুমানিকভাবে এক লাখ আলোকবর্ষ এবং পুরুত্ব প্রায় এক হাজার আলোকবর্ষ।

মহাবিস্ফোরণতত্ত্ব[১৫]। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বেলজিয়ামের পদার্থবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রে[১৬] এই তত্ত্বটি প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ একে অপর থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; তাই সম্ভবত অতীতে কোনো এক সময় মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ অনন্ত একবিন্দুতে ঘনীভূত ছিল। সেই ঘনীভূত অবস্থাকে কল্পনা করা হয় মহাজাগতিক গোলক (অতিপরমাণু)[১৭] হিসেবে। জর্জ লেমিত্রে এই মহাজাগতিক গোলকটির নাম দেন আদিম পরমাণু[১৮]। প্রথমদিকে তিনি আইনস্টাইনের[১৯] আপেক্ষিকতা থেকে প্রাপ্তক্ষেত্রের সমীকরণের একটি সমাধান উপস্থিত করেন।

জর্জ হেনরি লেমিত্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় বেলজিয়ামের ক্যাথলিক লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী হিসেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন

১৫ Big Bang Theory.

১৬ *Georges Henri Joseph Edouard Lemaitre* (July 17, 1894 – June 20, 1966).

১৭ Superatom.

১৮ The *Primeval Atom.*

১৯ আলবার্ট আইনস্টাইন জার্মানির একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পুরস্কার লাভের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় : তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান, বিশেষত আলোকতড়িৎ ক্রিয়াসম্পর্কিত গবেষণা। আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণা করেছেন। নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে তাঁর অবদান অনেক। সবচেয়ে বিখ্যাত আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব : বলবিজ্ঞান ও তড়িৎ-চৌম্বকতত্ত্বকে একীভূত করে। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব : অসম গতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নতুন মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর অন্যান্য অবদানের মধ্যে রয়েছে : আপেক্ষিকতাভিত্তিক বিশ্বতত্ত্ব, কৈশিক ক্রিয়া, ক্রান্তিক উপলবৎ বর্ণময়তা, পরিসাংখ্যক বলবিজ্ঞানের চিরায়ত সমস্যাসমূহ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বে তাদের প্রয়োগ, অণুর ব্রাউনীয় গতির একটি ব্যাখ্যা, আণবিক ক্রান্তিকের সম্ভাব্যতা, এক আণবিক গ্যাসীয় পদার্থে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, নিম্নবিকিরণ ঘনত্বে আলোর তাপীয় ধর্ম (যা ফোটন তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করে), বিকিরণের একটি তত্ত্ব (যার মধ্যে উদ্দীপিত নিঃসরণের বিষয়টিও ছিল), একটি একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রথম ধারণা এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্যামিতিকীকরণ। বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্র তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর বিখ্যাত দুটি তত্ত্ব হচ্ছে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে টাইম সাময়িকী আইনস্টাইনকে *শতাব্দীর সেরা ব্যক্তি* হিসেবে ঘোষণা করে। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁকে সর্বকালের সেরা পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আইনস্টাইনের শৈশব কেটেছে জার্মানিতে। কৈশোর ইতালিতে। যৌবন সুইজারল্যান্ডে। প্রৌঢ়ত্ব জার্মানিতে। বার্ধক্য আমেরিকায়।

জার্মান সেনাবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ করলে তাঁর পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ পড়ে। তখন তিনি আর্টিলারি অফিসার হিসেবে বেলজীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এখানে ছিলেন চার বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, তিনি প্রকৌশলীর কাজে ফিরে না গিয়ে পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র নিয়ে উৎসাহী হয়ে পড়েন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশাপাশি ধর্মযাজকের পেশায়ও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের সাহচর্য লাভ করেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর্থার এডিংটন তাঁর গাণিতিক দক্ষতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানে মুগ্ধ হন। এক সময় লেমিত্রে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে চলে যান আমেরিকায়। এখানে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে আবার বেলজিয়াম ফিরে আসেন। ক্যাথলিক লুভেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে যোগ দেন। এখানেই তিনি আইনস্টাইনের *আপেক্ষিক তত্ত্বের* সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে নিজের *মহাজাগতিক কাঠামো* তৈরি করেন।

জর্জ হেনরি লেমিত্রের সমাধান ছিল অনেকটা আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যানের মতোই। আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান প্রস্তাব করে বিকাশমান বা সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বতত্ত্ব। তিনি জ্যামিতিকভাবে প্রস্তাব করেন যে, মহাশূন্য শুধু বাঁকাই নয়, মহাবিশ্বে নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ দূরে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সমাধানে মহাজাগতিক ধ্রুবকটি হিসাবে আনার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। জর্জ হেনরি লেমিত্রের সমাধান থেকে বেরিয়ে আসে মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এমনকি সময়ের ঘড়িকে পেছনের দিকে চালিয়ে তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তের একটি চিত্রও উপস্থাপন করেন, গাণিতিকভাবে। কাব্যিকভাবে এই সময়কে তিনি অভিহিত করেন *গতকাল বিহীন* একটি দিন[২০] হিসেবে। তিনি এই মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাকে চেপেঠেসে ঘনসন্নিবদ্ধ একটি ছোটো মহাবিশ্বে পরিণত করেন। তার নাম দেন *আদিমকণা*, যা থেকেই তৈরি হয়েছে এই মাহাবিশ্ব।

জর্জ হেনরি লেমিত্রের *আদিমকণা* তত্ত্ব ও মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারে আইনস্টাইন স্বয়ং আপত্তি তোলেন। আইনস্টাইন যে মহাবিশ্বের রূপ প্রস্তাব করেন, তাতে মহাবিশ্ব ছিল নিশ্চল-স্থিতিশীল। তাঁর মহাবিশ্বে

২০ A Day without yesterday.

নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ বিরাজ করে চিরস্থির দূরত্বে। মহাবিশ্বের আকৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আইনস্টাইনের নিজের সমীকরণেই মহাবিশ্বের প্রসারণের ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। গাণিতিকভাবে তিনি মহাবিশ্বরকে নিশ্চল-স্থিতিশীল রূপ দিতে *মহাজাগতিক ধ্রুবক* (কল্পিত বিকর্ষণ শক্তি) চাপিয়ে দেন। ফ্রিডম্যান ও লেমিত্রে মহাবিশ্বকে উদ্ধার করেন নিশ্চল-স্থিতিশীলতা থেকে। *মহাজাগতিক ধ্রুবকের* বাইরে গিয়ে সমাধান উপস্থিত করেন। তাই আইনস্টাইন *মহাজাগতিক ধ্রুবক* বিবেচনার মধ্যে না-আনার জন্য তাঁদের তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ব্রাসেলসের এক সেমিনারে লেমিত্রে যখন তাঁর *মহাজাগতিক কাঠামো* আইনস্টাইনের সামনে তুলে ধরেন তখন আইনস্টাইন বিনাবাক্যেই তা বাতিল করে দেন।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে এডুইন পাওয়েল হাবেল[২১] যখন মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে সেই সময়কার একশত ইঞ্চি ব্যাসের সবচেয়ে বড়ো টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, মহাবিশ্ব আসলে প্রসারিত হচ্ছে, তখন আইনস্টাইনের তত্ত্ব ভ্রান্ত ও লেমিত্রের *আদিমকণাতত্ত্ব* ও মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এডুইন পাওয়েল হাবেল যুগনির্দেশক পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে; কারণ, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ পরস্পর থেকে ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে; অর্থাৎ অতীতযুগে বস্তুপিণ্ডগুলো পরস্পরের নিকটতর ছিল। তিনি *মহাজাগতিক ধ্রুবককে* স্বীকার করে নিয়ে গাণিতিকভাবে তার মাননির্ণয় করেন *শূন্যঘনমানতা*। তাছাড়া তাঁর মতে, মহাবিস্ফোরণের কারণে স্থানকাল ও পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে; অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে *সময়ের* জন্ম হয়েছে; পূর্বতন *সময়ের* সংজ্ঞা বাতিল হয়ে যায়; অর্থাৎ কালের আরম্ভ সম্পর্কে আগে যা

২১ এডুইন পাওয়েল হাবেল (*Edwin Powell Hubble*; জন্ম : ২০শে নভেম্বর ১৮৮৯; মৃত্যু : ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩)। হাবেলের সূত্র : পদার্থবিজ্ঞানের মহাকাশবিদ্যার একটি আবিষ্কার যা প্রকাশ করে (এক) গভীর মহাকাশে যেসব বস্তু দেখা যায় তা পৃথিবীর সাপেক্ষে এবং একে অপরের সাপেক্ষে একটি আপেক্ষিক বেগে চলে; (দুই) এই বেগ পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। অর্থাৎ দুরবর্তী ছায়াপথগুলোর দূরত্ব এবং অপসারণ বেগের মধ্যে বিদ্যমান সমানুপাতিক সম্পর্ককে হাবেলের সূত্র বলে। এই সম্পর্কটিতে বেগ ও দূরত্বের অনুপাত যে ধ্রুবকসংখ্যা তাকে হাবেলের ধ্রুবক বলে। বস্তুত পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত মহাকাশ দিনে দিনে আয়তনে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক প্রকাশ করে হাবেলের সূত্র।

বলা হয়েছে তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মহাবিস্ফোরণের আগে কোনোকিছুর সৃষ্টি অনুমান করা অর্থহীন। তাই মহাবিস্ফোরণেই মহাবিশ্বের সূচনা।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো[২২] মহাবিস্ফোরণের ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে *মহাবিস্ফোরণ* তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জর্জ গ্যামো বৈজ্ঞানিক মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব ধারণাটি বিজ্ঞানজগতে প্রতিষ্ঠা করেন। জর্জ গ্যামোর আদিনিবাস ছিল রাশিয়ায়। আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান ছিলেন তাঁর শিক্ষক। জর্জ গ্যামোর ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে আরেক প্রখ্যাত তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক হোয়েল সর্বপ্রথম *মহাবিস্ফোরণ* তত্ত্ব শব্দটি ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করেন। তিনি ছিলেন *মহাবিস্ফোরণ* তত্ত্বের বিপরীতে স্থিতিশীল মহাবিশ্বের অন্য একটি জনপ্রিয় কাঠামো *অটল অবস্থার মহাবিশ্বের* প্রবক্তা। ফ্রেডারিক হোয়েলের তত্ত্বের সঙ্গে প্রথমদিকে যুক্ত ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হারমান বনডি ও টমাস গোল্ড। পরবর্তীতে যুক্ত হন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকরও। তাঁদের মহাবিশ্বে কোনো মহাবিস্ফোরণ নেই, কোনো শুরুও নেই। তাঁদের মতে মহাবিশ্ব চিরকাল ছিল, এই রূপেই আছে। তাঁদের *অটল অবস্থার মহাবিশ্বে* সৃষ্টি হয় নব নব নক্ষত্রপুঞ্জ যখন প্রাচীন নক্ষত্রপুঞ্জসমূহ দূরে সরে যায়। তাই মহাবিশ্ব এই রূপে আছে। তাঁদের মতে মহাবিশ্বে চলছে *ধারাবাহিক সৃষ্টি*। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্ম নিচ্ছে, যা রসায়নের ভরসংরক্ষণ নীতি প্রচণ্ড বিরোধী।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে এক বেতার অনুষ্ঠানে জর্জ গ্যামো ও তাঁর অনুসারীদের ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে ফ্রেডারিক হোয়েল ব্যঙ্গ মন্তব্য করেন। তিনি উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণের ছাইভস্ম ও মহাবিস্ফোরণের *ফসিল* দেখার কথা বলেন। রালফ আশের আলফার[২৩] ও জর্জ গ্যামো যুক্তভাবে

২২ জর্জ গ্যামো (*George Gamow*; জন্ম : চৌঠা মার্চ ১৯০৪; মৃত্যু : ১৯শে আগস্ট ১৯৬৮) একজন ইউক্রেনীয় পদার্থবিজ্ঞানী এবং বিশ্বতত্ত্ববিদ। তাঁর মূল নাম গ্রেগরি আন্তোনভিচ গ্যামফ। কোয়ান্টাম টানেলিং আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁর বিখ্যাত : পারমাণবিককেন্দ্রিক তেজস্ক্রিয় ভাঙন, তারার বিবর্তন, নাক্ষত্রিককেন্দ্রিক সংশ্লেষ, মহাবিস্ফোরণ কেন্দ্রিক সংশ্লেষ এবং জিনতত্ত্ব।

২৩ রালফ আশের আলফার (Ralph Asher Alpher; জন্ম : তেসরা ফেব্রুয়ারি ১৯২১; মৃত্যু : ১২ই আগস্ট ২০০৭) ছিলেন একজন মার্কিন মহাজাগতিক বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের ওপর

রসায়ন পদার্থের জন্ম[২৪] (আলফা-বিটা-গামা পেপার) শিরোনামে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে গ্যামো ধারণা করেন যে, একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেই ভয়ংকর বিকিরণের কিছুটা স্বাক্ষর, মানে বিকিরণরেশের কিছুটা এখনো বজায় থাকার কথা। গ্যামো গাণিতিকভাবে দেখান যে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজময় বিকিরণের উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালি তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে সেটি এখন পরমশূন্য তাপমাত্রার ওপরে পাঁচ কেলভিনের মতো হওয়া উচিত। এই তেজময় বিকিরণের অবশেষকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পশ্চাৎপট বিকিরণ[২৫]। মহাশূন্যে বিকিরণের প্রকৃতি অণুতরঙ্গ। সৃষ্টির আদিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল যেন একটি উত্তপ্ত অণুতরঙ্গের চুল্লি, যা এখন ঠান্ডা হয়ে পাঁচ কেলভিনে এসে পৌঁছেছে।

গ্যামো ও আলফারের মতে, মহাবিস্ফোরণের পর থেকে শুরু করে তিন লাখ আশি হাজার বছর পর্যন্ত মহাবিশ্ব অস্বচ্ছ গোলকের মতো ছিল। আহিতকণা ধোঁয়াশায় অণুরা জোড় বাঁধতে পারেনি। প্রায় চার লাখ বছর পর, তাপমাত্রা খানিকটা কমে ৩,০০০ কেলভিনে নেমে আসে। এই সময়ের পরই কেবল স্থায়ী অণু গঠিত হওয়ার মতো পরিবেশ তৈরি হয়। এই সময়ই মহাবিশ্ব ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আলোককণা আহিতকণা ধোঁয়াশার খাঁচায় আটকে না থেকে পাড়ি দিতে শুরু করে অন্তবিহীন পথে। গ্যামো ও আলফার তাঁদের গবেষণায় দেখান যে, মহাবিস্ফোরণ যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সেই আলোর অপভ্রংশ এখনো খুঁজে পাওয়া যাবে। সেটিই মহাবিস্ফোরণের *ফসিল*, যেটির জন্য ফ্রেডারিক হোয়েল উৎসুক ছিলেন। গ্যামো ও আলফার জানতেন, মহাবিস্ফোরণের পর থেকে মহাবিশ্ব হাজারগুণ প্রসারিত হয়েছে। তাই যে আলোকতরঙ্গ দেখার প্রয়াস নেওয়ার কথা বলা হয় সেটি বর্তমানে হবে মোটামুটি এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করে মহাবিস্ফোরণের নিউক্লিওসিনথেসিস এবং *মহাজাগতিক অণুতরঙ্গের পশ্চাৎপট বিকিরণে*।

২৪ *Origin of the Chemical Elements*, Physical Review, Ralph Asher Alpher and George Gamow, 1st April 1948.

২৫ মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পশ্চাৎপট বিকিরণ (Cosmic Microwave Background Radiation) : ভৌত বিশ্বতত্ত্বে আলোচিত এক ধরনের তাড়িত-চৌম্বকবিকিরণ যা সমগ্র মহাবিশ্বজুড়ে সমরূপভাবে (আইসোট্রপিক) বিস্তৃত।

কোনো তরঙ্গ; অর্থাৎ তড়িৎ-চৌম্বকীয় পরিসীমায় যাকে শনাক্ত করা যাবে বেতারতরঙ্গ হিসেবে। আর এই বিকিরণের তাপমাত্রা হবে পাঁচ কেলভিনের মতো। আসলে গ্যামোর সময়ে মহাবিশ্বের প্রান্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণাগুলোকে পদার্থবিজ্ঞানের মূলধারা হিসেবে না-দেখে দেখা হতো পাগলাটে বিজ্ঞানীদের কল্পনাবিলাস হিসেবে। আরেকটা মূল কারণ অনেকে মনে করেন যে, গ্যামোর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি আর রঙ্গপ্রিয়তা। গ্যামো একবার গণনা করে দেখান যে, ঈশ্বর নাকি পৃথিবী থেকে সাড়ে নয় আলোকবর্ষ[২৬] দূরে থাকেন। গণনার হিসাব এসেছিল ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে জাপান-রাশিয়া যুদ্ধের সময়, রাশিয়ার কিছু ধর্মপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধের ভয়াবহতা কমানোর জন্য বিশেষ গণপ্রার্থনার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সে প্রার্থনায় তাৎক্ষণিক কোনো ফল না পেলেও ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ক্যানতো ভূমিকম্পে জাপানের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ থেকে গ্যামো সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঈশ্বরের অভিশাপ আলোর বেগে এসে পৌঁছাতে যেসময় লেগেছে তাতে করে পাওয়া যায় ঈশ্বর থাকেন পৃথিবী থেকে সাড়ে নয় আলোকবর্ষ দূরে।

২৬ মহাজাগতিক দূরত্ব প্রকাশের একক হচ্ছে *আলোকবর্ষ*। জ্যোতির্বিজ্ঞানীবৃন্দ মহাবিশ্বের বিভিন্ন নক্ষত্র *আলোকবর্ষ* একক দিয়ে দূরত্ব পরিমাণ করেন। এক সেকেন্ডে আলোর গতি প্রায় ৩ × ১০^{৮} মিটার। এই হিসাবে আলো এক বছরে (৩৬৫ দিনে) যত দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হচ্ছে আলোকবর্ষ (প্রায় ১০^{১৬} মিটার; এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। পৃথিবী থেকে সূর্য পনেরো কোটি কিলোমিটার (নয় কোটি ত্রিশ মাইল) দূরে। পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে আট মিনিট আঠারো সেকেন্ড লাগে। নক্ষত্র প্রোক্সিমা সেন্টোরি রয়েছে পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ একচল্লিশ লাখ কোটি কিলোমিটার দূরে। ধ্রুবতারা (পোলারিস) ৬৫০ আলোকবর্ষ দূরে। লুব্ধক (সিরিয়াস) ৮.৭ আলোকবর্ষ দূরে। একক পারসেক (সংক্ষেপে পিসি) হচ্ছে ৩.২৬ আলোকবর্ষ। এই সময়ে আলো ভ্রমণ করে ৩ × ১০^{১৬} মিটার।